ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ

মোঃ আবদুল ওহাব মিয়া*

Abstract: Shams Uddin Ilyas Shah was one of the greatest Sultans of Bengal in the middle ages. He came to Bengal from Persia through Delhi as a fortune seeker. But with his strong personality and sagacity he became able to reach to throne of Bengal. After capturing the power of Firojabad, he planned to establish an independent Sultanate in Bengal. For this he waged war policy for annexation of his state invading the neighbouring states and collecting booties. Formarly Bengal was divided into some parts. For the first time he united all the geo-political units of Bengal under the banner of the Sultanate of Bengal. Moreover, Ilyas Shah adopted tolerant policy towards the non-Muslims and appointed them in the state services in large scale. As a result, these people stood firmly with him at the invasion of Delhi. Due to their support he was able to retain the independence of newly established Bengal Sultanate. From his time this independence continued for two hundred years at a time. So, Shams Uddin Ilyas Shah was the founder of the independent Bengal Sultanate.

ভূমিকা

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে যে সকল শাসক তাদের অসাধারণ প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ অন্যতম। তিনি অতি সাধারণ অবস্থা থেকে স্বীয় যোগ্যতাবলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করে বাঙ্গালা নামে একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর একচ্ছত্র অধিপতি হবার গৌরব অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে যশ ও খ্যাতির সাথে রাজত্ব করেছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানরা বাংলায় এক উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসময় থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থা বিদেশী শাসনের প্রকৃতি পরিত্যাগ করে দেশীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহের দূরদর্শিতা ও বাস্তব জ্ঞান থাকার ফলে তিনি এদেশীয় লোকদের সাথে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে

* গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি তাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া দিলিণ্ঢর সুলতানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বহুদিন যাবৎ বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। এজন্য দিলিণ্ঢর ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাকে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ, শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান ও সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ বলে অভিহিত করেন।[১]

পরিচয়

ইলিয়াস শাহের পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায় না। আরবের দুজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক[২] আল সাখাভি এবং ইবন-ই-হজর গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের কথা লেখার সময় তাঁর পিতামহ ইলিয়াস শাহকে অল সিজিস্তানি বলে উলেণ্ঢখ করেছেন।[৩] এ থেকে মনে হয়, তার আদি বাসস্থান ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। ইলিয়াস শাহ ইসলামের অন্যতম ধর্মীয় কাজ পবিত্র হজ সম্পাদন করেছিলেন এবং ইহা তাঁর হাজি উপাধি থেকে বুঝতে পারা যায়। তিনি বা তাঁর পরিবার কিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত অন্যান্য মধ্য এশিয়ার ভাগ্যান্বেষীদের মতো ইলিয়াস শাহও দিলিণ্ঢতে এসেছিলেন। আলী মুবারক নামে তাঁর একজন দুধভাই ছিলো। তারা দুজনে দিলিণ্ঢর মালিক ফিরোজ বিন রজব (পরে দিলিণ্ঢর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক) এর অধীনে চাকরি করতেন।[৪] এক সময় হাজি ইলিয়াস কোন অপকর্ম করে দিলিণ্ঢ থেকে পলায়ন করেন। মালিক ফিরোজ হাজি ইলিয়াসকে ধরে আনার জন্য আলী মোবারককে প্রেরণ করেন। কিন্তু আলী মোবারক এ কাজে ব্যর্থ হলে ফিরোজ আলী মোবারককেও দিলিণ্ঢ থেকে বিতাড়িত করেন।[৫] ফলে আলী মোবারক বাংলায় চলে আসেন এবং লখনৌতির গভর্নর কদর খানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং পরে কদর খানকে হত্যা করে আলাউদ্দিন আলী শাহ উপাধি ধারণ করে শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। এ সময়ে হাজি ইলিয়াস লখনৌতিতে উপস্থিত হলে আলী শাহ তাকে বন্দি করেন এবং মাতার অনুরোধে তাকে ছেড়ে দিয়ে সেনা বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। হাজি ইলিয়াস সেনাবাহিনীর পদ লাভ করার পর আলী শাহের সৈন্যদলকে অনুগত করে ফেলেন। পরে ১৩৪২ সালে খোজাগণের সাহায্যে আলী শাহকে হত্যা করে শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং নিজেকে সুলতান ঘোষণা করে ফিরোজাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬]

ইলিয়াস শাহ সম্পর্কে জানার জন্য দিলিণ্ঢর ঐতিহাসিকদের বিবরণীর উপর বেশি নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইলিয়াস শাহ দিলিণ্ঢর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে যুদ্ধ করেন। ফলে দিলিণ্ঢর ঐতিহাসিকরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে তাঁর নামে কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করতেন বলে মনে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক ইলিয়াস শাহকে ভাংখোর ও কুষ্ঠরোগী বলে উলেণ্ঢখ করেছেন।[৭] আবার কারো মতে, ইলিয়াস শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান শামস উদ্দিন ভাঙ্করা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৮] সম্ভবত ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালা কথাটা ভুলক্রমে ইলিয়াস শাহ ভাঙ্করায় পরিণত হয়েছে।[৯] তবে ইলিয়াস শাহের জীবনের প্রথম দিকের কর্মকাণ্ড তেমন উলেণ্ঢখযোগ্য না হলেও, সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

আমরা বর্তমান যে বাংলাদেশে বাস করি প্রাচীনকালে তা একভাষিক রাষ্ট্রসত্তা বা একভাষিক জাতিসত্তা ছিল না। এমনকি বর্তমান কালের মত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মত একটি বিশেষ নামে পরিচিত কোন নিরবচ্ছিন্ন ভৌগোলিক এলাকাও ছিল না।[১০] প্রাচীন কাল থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামে কতগুলো জনপদে বিভক্ত ছিল। এ জনপদগুলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আবার কখনো হয়েছে বিচ্ছিন্ন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন। তার সময়ে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর বাংলাদেশের তিনটি জনপদ বড় হয়ে দেখা দেয় এবং অন্যান্য জনপদ সেগুলোর কাছে স্ম্পান হয়ে যায়। এ জনপদ তিনটি হচ্ছে পুন্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ। শশাঙ্ক ও পাল রাজারা রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদেরকে গৌড়ের শাসনকর্তা হিসেবে পরিচয় দিতেন।[১১] গৌড় নামে সমগ্র দেশকে শশাঙ্ক, পালরাজারা ও সেনরাজারা সংহত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ জনপদের জয় হয় মুসলিম শাসনামলে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি সেন বংশের শাসনকর্তা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া জয় করেন। লখনৌতিতে (গৌড়ে) রাজধানী স্থাপন করে দিলিণ্ডর প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলের কিছু অংশে অবস্থিত ছিল। প্রায় দেড়শ বছর ধরে মুসলিম রাজ্য ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১২] অতঃপর বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ। তিনি ছিলেন সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা বাহরাম খানের সিলাহদার বা বর্মরক্ষক। বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তিনি ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৩] বাংলা তখন দিলিণ্ড সালতানাতের অংশ হিসেবে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লখনৌতি এই তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ফখর উদ্দিনের এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে সাতগাঁও ও লখনৌতির শাসনকর্তারা সুনজরে দেখেননি। ফলে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা যথাক্রমে ইজ্জউদ্দিন ও কদর খান ঐক্যবদ্ধভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা করতে পারবেন না বুঝতে পেরে ফখর উদ্দিন সোনারগাঁও ছেড়ে পালিয়ে যান। এতে তারা বিনা রক্তপাতে সোনারগাঁও জয় করেন। কিন্তু পরবর্তীতে সম্পদের বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে কদর খান নিহত হন। ফলে ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ সোনারগাঁও পুনর্দখল করেন। কদর খানের অনুপস্থিতিতে প্রধান সেনাপতি আলী মুবারক লখনৌতির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে হাজি ইলিয়াস আলী মুবারককে হত্যা করে শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে ফিরোজাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বকালের পূর্বে বাংলাদেশ ত্রিধা বিভক্ত ছিল এবং একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও একত্র করার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবসান হয়ে অখণ্ড বাংলা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং দিলিণ্ডর আগ্রাসন প্রতিহত করে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে দুইশত বছর বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে।[১৪]

বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় ইলিয়াস শাহের অবদান

ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে যখন ফিরোজাবাদের সিংহাসনে বসেন তখন শুধু লখনৌতি ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ তাঁর অধীনে ছিল। সোনারগাঁও, সাতগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চল তখনও তাঁর শাসনের বাইরে ছিল। তাই সিংহাসনারোহণের পরই তিনি রাজ্যজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকের মুদ্রায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[১৫] রাজত্বের শুরু থেকেই তিনি যে উচ্চাভিলাষী ছিলেন তা উপাধি গ্রহণের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায়। তিনি নিজ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি এবং সম্পদ হস্তগত করা এ দুটো বিষয়কে সামনে রেখে অভিযান পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি বাংলা ও বাংলা ভূ-খণ্ডের বাইরেও অভিযান পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সোনারগাঁও তার পাশ্ববর্তী রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ প্রবল শক্তিশালী এবং নদীবহুল এলাকা হওয়ায় সোনারগাঁও জয় করা সহজ হবে না ভেবে ভিন্ন দিকে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন।

সাতগাঁও অধিকার

সুলতান ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করলেও ১৩৪৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত সাতগাঁও এর রাজনৈতিক অবস্থার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। সম্ভবত সাতগাঁও তখনো দিলিণ্ডর অধীনে ছিল। ১৩৪৬ সালে সাতগাঁও টাকশাল থেকে জারিকৃত তার মুদ্রা পাওয়া যায়।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, ১৩৪৬ সালে তিনি সাতগাঁও দখল করে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন।

নেপাল আক্রমণ

ইলিয়াস শাহ ১৩৫০ সালে নেপাল অধিকার করেন। তবে নেপাল আক্রমণ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। নেপাল রাজবংশাবলি থেকে ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭] এতে লিখিত আছে যে, ১৩৪৯ সালে নেপালের রাজা জয়রাজ মলণ্ড পশুপতিনাথের কোষ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন এবং তার পরে পূর্বদেশের সুলতান শামসা দীনা (সুলতান শামস উদ্দিন) নেপাল আক্রমণ করেন এবং পশুপতিনাথের মূর্তিকে তিনখণ্ড করে ফেলেন। কাঠমুন্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও এ আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ আক্রমণের তারিখ ১৩৫০ সাল বলে উলেণ্ডখ করা হয়েছে। সম্ভবত ধন-সম্পদ হস্তগত করাই ছিল এ অভিযানের মূল লক্ষ্য।[১৮] তাছাড়া নেপালের সামরিক শক্তি খর্ব করাও তার আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে নেপালের কোন অংশ তার রাজ্যভুক্ত করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১৯] ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নেপাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভার নিদর্শন বলে বিবেচিত।

ত্রিহুত অধিকার

উত্তর বিহার ত্রিহুত নামে পরিচিত ছিল এবং ইহা দিলিণ্ডর করদ রাজ্যে পরিণত হয়। সেখানে শক্তিসিংহ ও কামেশ্বর নামে দুজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত আক্রমণ করে একে একে উভয়কে পরাজিত করে ত্রিহুত জয় করেন।[২০] তখন বিহারস্থ দিলিণ্ডর গভর্নর মালিক ইব্রাহীম বায়ু কর্তৃক ইলিয়াস শাহকে বাধা দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দিলিণ্ডর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক অন্য সমস্যায় ব্যস্ত থাকায় তার মিত্রদের কোন সহযোগিতা করতে পারেননি। ইলিয়াস শাহের আক্রমণের

কারণেই ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়।[২১] ইলিয়াস শাহ উত্তর বিহারের ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হাজিপুর পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে মনে হয়। হাজি ইলিয়াসের নামানুসারে হাজিপুর নামক স্থানের নামকরণ হয়েছে বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে।[২২]

সোনারগাঁও অধিকার

ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সালে সাফল্যজনকভাবে সোনারগাঁও-এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময়ে ফখর উদ্দিন মুবারক শাহের পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ এ অঞ্চল শাসন করতেন। ১৩৫২ সালে সোনারগাঁও টাকশাল থেকে জারিকৃত উভয়ের মুদ্রা পাওয়ায় ধারণা করা হয়, ঐ সালের যে কোন সময় ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করেন। ইলিয়াস শাহ ইতঃপূর্বে লখনৌতি ও সাতগাঁও দখল করেছিলেন, সোনারগাঁও দখলের ফলে তিনি সারা বাংলার অধীশ্বর হলেন। ইলিয়াস শাহের পূর্বে বাংলার কোন মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলার অধীশ্বর ছিলেন না।

জাজনগর ও বিহার আক্রমণ

সোনারগাঁও অধিকারের পর ইলিয়াস শাহ বাংলার বাইরে রাজ্যসীমা বৃদ্ধিকল্পে অভিযান প্রেরণ করার মত শক্তি অর্জন করেন। এরপর ইলিয়াস শাহ জাজনগর(উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং চিল্কাহ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ৪৪ টি হাতিসহ অনেক ধন-সম্পদ হস্তগত করেন।[২৩] উড়িষ্যা আক্রমণের পর তিনি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ বিহার আক্রমণ করেন। বিহার তখনও দিলিণ্ঢর সুলতানের অধীনে ছিল। ইতঃপূর্বে বাংলার আর কোন সুলতান উড়িষ্যার এত অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেন নাই। এই অভিযান সমূহের ফলে অন্ততপক্ষে দ্বারকেশ্বর নদ পর্যন্ত তার রাজ্যসীমা বিস্ড়ৃত হয়েছিল।[২৪]

চম্পারন, গোরক্ষপুর ও কাশি অধিকার

ইলিয়াস শাহ বিহার থেকে আরো পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে চম্পারন, গোরক্ষপুর ও কাশি জয় করে এক বিশাল এলাকা তার রাজ্যভুক্ত করেন এবং বাহরাইচে শায়খ মামুদ গাজির দরগায় গিয়ে দুবার ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[২৫] কথিত আছে যে, বাংলায় ফিরে ইলিয়াস শাহ তার বিশাল সহায় সম্পদ ও সমর শক্তি নিয়েও দিলিণ্ঢর শায়খ-উল-ইসলাম নিজাম উদ্দিনের দরগায় ভক্তি নিবেদন না করতে পারার জন্য আক্ষেপ করেন।[২৬] কারণ এ পর্যন্ত অপরাজেয় সমর শক্তি তাঁর আত্মবিশ্বাসকে এতই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, দিলিণ্ঢ সালতানাত তাঁর কাছে অজেয় মনে হয়নি, যদিও তার এই সাফল্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

কামরূপ ও ত্রিপুরা আক্রমণ

সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের সর্বশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল কামরূপের বিরুদ্ধে। একমাত্র মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে সুলতান ইলিয়াস শাহের কামরূপ অভিযানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইলিয়াস শাহের রাজত্বের শেষ বছর ১৩৫৭ সালে সিকান্দার শাহের মুদ্রায় চৌলিস্তান ওরফে কামরূপ নামে টাকশালের উলেণ্ঢখ দেখা যায়।[২৭] এ থেকে মনে হয়, সুলতান ইলিয়াস শাহ কামরূপ রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করে সম্ভবত এ রাজ্যের একাংশ জয় করেছিলেন। মুদ্রা থেকে দেখা যায়, আরসা কামরূপ নামে এ অঞ্চলের নামকরণ করে উক্ত অঞ্চলে শাসন কেন্দ্র ও টাকশাল নির্মিত হয়। সাধারণত বিজয়ের স্মারক হিসেবে নতুন স্থান থেকে মুদ্রা প্রচলনের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু মুদ্রা নির্মিত হবার পূর্বেই

ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হওয়ায় নতুন সুলতান হিসেবে তার পুত্র সিকান্দার শাহের নাম মুদ্রায় উৎকীর্ণ করা হয়। কারণ সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথেই সিকান্দার শাহের পক্ষে কামরূপ জয় সম্ভবপর ছিল না।[২৮]

দিলিণ্ঢর সুলতানের সাথে সংঘর্ষ: কারণ

সুলতান ইলিয়াস শাহের সাথে দিলিণ্ঢর সুলতানের সম্পর্ক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। বাংলায় আসার পূর্বে ইলিয়াস শাহের সাথে ফিরোজ শাহের তিক্ত সম্পর্ক ছিল। বাংলায় এসে এত সুকৌশলে সাতগাঁও ও লখনৌতির শাসনপদ দখল করলেন যে, দিলিণ্ঢর তৎকালীন সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক কিছুই জানতে পারলেন না।[২৯] তাছাড়া ইলিয়াস শাহ কর্তৃক রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি দিলিণ্ঢ সুলতানের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাড়ায়। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বরনি ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের কারণ হিসেবে লখনৌতির শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহ কর্তৃক অনেক পাইক ধনুক সংগ্রহ করে ত্রিহুত আক্রমণ, মুসলমান ও জিম্মিদের উপর অত্যাচার, লুটতরাজ করে শহরগুলি ছারখার করাকে উলেণ্ঢখ করেছেন।[৩০] গোলাম হোসেন সলিমের মতে, ইলিয়াস শাহ দিলিণ্ঢর সুলতান ইলতুতমিশ কর্তৃক নির্মিত হাউজ-ই-শামসি নামক হাম্মাম বা স্নানাগারের মত একটি স্নানাগার নির্মাণ করেছিলেন তাই ইলিয়াস শাহের স্পর্ধা ধুলিসাৎ করার জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন।[৩১] সুতরাং ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালের নভেম্বর মাসে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে লখনৌতির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।[৩২] বাংলাদেশ আক্রমণ করার সময় ফিরোজ শাহ একখানি 'নিশান' বা ঘোষণাপত্র জারি করেন। ফিরোজ শাহের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মচারি মালিক অয়নুল মূলক মাহরূর চিঠি পত্রের সংকলন গ্রন্থ 'ইনশা-ই-মাহরূ'র মধ্যে এই নিশানখানি সংরক্ষিত আছে।[৩৩] এই নিশানের অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।[৩৪]

> যেহেতু আমাদের কানে (এই সংবাদ) এসেছে যে,–ইলিয়াস হাজি লখনৌতি এবং ত্রিহুত অঞ্চলের লোকদের উপর যথেচ্ছারিতা ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে, অহেতুক রক্তপাত করছে , এমনকি স্ত্রীলোকদেরও রক্তপাত করছে, যদিও প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এই যে, কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করা চলবেনা, যদি সে স্ত্রীলোক কাফের হয়, তবুও না; এবং (ইলিয়াস হাজি) ইসলামের আইনে অনুমোদিত নয়, এমন সব কর আদায় করে লোকদের কষ্ট দিচ্ছে; জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও সতীত্বের ও নিরাপত্তা নেই এবং যেহেতু এই অঞ্চল আমাদের প্রভুরা (পূর্ববর্তী রাজারা) জয় করেছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ও ঈমানের দান হিসেবে আজ তা আমাদের হাতে এসেছে, আমাদের রাজকীয় ও সাহসী সত্তার উপরে ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিধান (করার দায়িত্ব) বর্তেছে; এবং যেহেতু ইলিয়াস হাজি পরলোকগত সম্রাটের (মুহম্মদ বিন তুঘলক) জীবিতাবস্থায় সম্রাটের প্রতি বশ্য ও অনুগত ছিল, এবং আমাদের পবিত্র অভিষেকের সময়ে সে অধীন ব্যক্তির মত বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিল, আমাদের কাছে সে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল এবং আমাদের সেবা করার জন্য (তার) ভৃত্যদের পাঠিয়েছিল; তাই আলণ্ঢাহর সৃষ্ট প্রাণিদের উপরে সে যে অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ যদি ইতিপূর্বে আমাদের গোচরে আসত, তাহলে আমরা তাকে সাবধান করে দিতাম, যার ফলে সে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারত; এবং যেহেতু সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ও প্রকাশ্যে আমাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আমরা এক অপরাজেয় সৈন্য বাহিনী নিয়ে এই দেশ উন্মুক্ত করার জন্য এবং এখানকার অধিবাসীদের সুখের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার) জন্য এর সন্নিহিত হয়েছি এই আশা নিয়ে যে এর দ্বারা সবাইকে

উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করব, বিচার ও দয়ার প্রলেপ দিয়ে অত্যাচারের ক্ষত আরোগ্য করব; এবং তার অত্যাচার ও নৃশংসতার উত্তপ্ত দূষিত ঝটিকার বিশুষ্ক তাদের অস্তিত্বের বৃক্ষ আমাদের উদারতার নির্মল জল নিজেকে বর্ধিত ও ফলবন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের দয়ার আধিক্য হেতু আমরা আদেশ দিয়েছি যে, লখনৌতি আঞ্চলের সকল লোকেরা সাদাৎ, উলেমা, মাশায়েখ ও এই জাতীয় অন্যান্য লোকেরা এবং খান, মালিক, উমরা, সদর, আকাবের ও মারিফ এবং তাদের অনুচরবর্গ, যারা তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারে অথবা যাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগ এই দিকে চালিত করে, তারা অপেক্ষা বা বিলম্ব না করে আমাদের বিশ্বরক্ষাকারী উপস্থিতির দিকে আসবে। তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, বৃত্তি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, তার চাইতে তাদের আমরা বেশী দেব; এবং কসই(কুশী) নদী থেকে লখনৌতির বেলায়েৎ নদীর সুদূর সীমা পর্যন্ত অঞ্চলে যে শ্রেণীর লোকেরা জমীনদার(জমিদার) ও মুকদ্দম নামে অভিহিত, তারাও আমাদের বিশ্বরক্ষাকারী উপস্থিতির সমীপে আসতে পারে। আমরা বর্তমান বছরের ফসল (যা কর স্বরূপ দিতে হয়) এবং শুল্ক পরিপূর্ণভাবে মাফ করে দেব; এবং আগামী বছর থেকে পরলোকগত সূলতান শামসুদ্দীনের[৩৫] রাজত্বকালে বলবৎ আইন অনুসারে রাজস্ব ও শুল্ক আদায়ের জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তার চেয়ে বেশী দাবী করা হবে না এবং অতিরিক্ত ও অবৈধ যে সমস্ত কর ও শুল্ক দেশের ঐ অঞ্চলের লোকের উপর অতিরিক্ত ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ মকুব ও উচ্ছেদ করা হবে; এবং যে সমস্ত সন্ন্যাসী, সাই ও গবর ইত্যাদি দলবদ্ধভাবে আমাদের বিশ্বরক্ষাকারী উপস্থিতির কাছে আসবে, তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে তাই মঞ্জুর করব; এবং যারা দুদলে ভাগ হয়ে আসবে, আমরা তাদের একটি বেকনা(?) মঞ্জুর করব; এবং যে কেউ একা আসবে, সে যা পেত, তাই আমরা মঞ্জুর করব। তাছাড়া আমরা তাদের আদি বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করব না অথবা তাদের ক্লেশের কারণ ঘটাব না; আমরা এই আদেশ দিয়েছি যে এই অঞ্চলে প্রত্যেকেই তাদের গৃহে অন্তরের আশা অনুযায়ী বাস করতে পারে এবং চিরকাল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করতে পারে–যদি আলণ্ঢাহ ইচ্ছা করেন।

উপরোক্ত নিশানখানি মূলত একটি প্রচারপত্র। এতে ইলিয়াস শাহকে অত্যাচারীরূপে চিত্রিত করে ফিরোজ শাহ কর্তৃক বাংলা আক্রমণের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির জনগণকে তার দলে ভিড়াবার জন্য নানা ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। নিশানে ইলিয়াস শাহকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের অভিষেক পর্যন্ত দিলিণ্ঢর অনুগত থাকার যে দাবি করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ ইলিয়াস শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই স্বাধীনভাবে মুদ্রা জারি করেন এবং কখনোই তিনি দিলিণ্ঢর অনুগত ছিলেন না। তাছাড়া অতিরিক্ত ও অবৈধ কর এবং শুল্ক মওকুফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইলিয়াস শাহ-ই অতিরিক্ত কর ও শুল্ক আরোপ করেছিলেন এমন কথা নিশানে বলা হয়নি। সুতরাং ফিরোজ শাহের প্রচারিত নিশানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না যে, ইলিয়াস শাহ অত্যাচারী ছিলেন এবং এরই প্রতিকারের জন্য তিনি বাংলায় অভিযান করেছিলেন। আসলে ফিরোজ শাহ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের অনেক কারণ ছিল। বাংলা এক সময় তুঘলকদের অধীনে ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলা স্বাধীন হয়ে যায় এবং ইলিয়াস শাহ সারা বাংলার অধিশ্বররূপে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ইলিয়াস শাহ এতই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে, তিনি দিলিণ্ঢ সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা দখল করেন। তিনি চম্পারন, কাশি,

গোরক্ষপুর ইত্যাদি জয় করার পর দিলিণ্ঢ সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়ে ওঠে। অতএব ফিরোজ শাহ বাধ্য হয়েই ইলিয়াস শাহকে স্বীয় রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং সম্ভব হলে হৃতরাজ্য বাংলা পুনর্দখল করার জন্য বাংলা অভিযান পরিচালনা করেন।

দিলিণ্ঢ সুলতানকে প্রতিহতকরণ কৌশল

ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা অভিযানের বিবরণী দিলিণ্ঢর সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এতে সামান্য কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে যুদ্ধের বিবরণ প্রায় একই রকম। তবে এসব ঐতিহাসিকদের বিবরণে পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক নব্বই হাজার অশ্বারোহী, লক্ষাধিক পদাতিক এবং এক হাজার নৌবহরের এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা, চম্পারন ও গোরক্ষপুরের ভিতর দিয়ে কুশি নদী অতিক্রম করে বাংলার দিকে যাত্রা করেন। ইলিয়াস শাহের বাহিনী কুশি নদীর তীরে দিলিণ্ঢর সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ কৌশলে একশত ক্রোশ উজানে গিয়ে নদী পার হন। ফিরোজ শাহের নদী পার হবার খবর পেয়ে ইলিয়াস শাহ দ্রুত ত্রিহুতের দিকে চলে আসেন এবং ত্রিহুত ত্যাগ করে রাজধানী ফিরোজাবাদ(পাণ্ডুয়া) আসেন। দিলিণ্ঢর বাহিনী নিকটবর্তী হলে ইলিয়াস শাহ রাজধানী প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করেই একডালা[৩৬] নামক একটি নিকটবর্তী স্থানের দূর্গে আশ্রয় নেন এবং আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এর তিন দিক বালিয়া, চিরামতি ও মহানন্দার জল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং অন্যদিকে ছিল ঘন অরণ্য। খুব সম্ভবত প্রাকৃতিক এই দুর্ভেদ্যতার জন্যই ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৩৭] দিলিণ্ঢর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্যের আশা না করে ইলিয়াস শাহ নিপুণ সমরনীতির পরিচয় দেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জল ও জঙ্গল ঘেরা একডালা দুর্গ জয় করা দিলিণ্ঢ সৈন্যদের পক্ষে সহজ হবে না এবং বর্ষাকালের প্রবল বর্ষণ এবং মশার দংশন দিলিণ্ঢর সৈন্যগণ সহ্য করতে পারবে না এবং বাংলা জয়ের আশা ত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।[৩৮]

ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়া দখল করে একডালা দুর্গের নিকটবর্তী নদীর বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করে দুর্গ অবরোধ করেন।[৩৯] কিন্তু জল বেষ্টিত কাদামাটি দ্বারা প্রস্তুত এ দুর্গটি জয় করা ফিরোজ শাহের সৈন্যদের পক্ষে সহজ ছিল না। ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গের অভ্যন্তর থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে লাগলেন এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত দিলণ্ঢীর সৈন্যদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেন। বাইশ দিন ধরে দিলণ্ঢীর সেনাবাহিনী দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ ছাড়া তেমন কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছিল না। এদিকে বর্ষাকাল প্রায় সমাগত। ফিরোজ শাহের সৈন্যগণ বাংলাদেশের অবিরাম বৃষ্টি এবং মশার আক্রমণে অসহ্য যন্ত্রনার কবলে পড়ে। একদিন সুলতান ফিরোজ শাহ তার সৈন্যদের শিবির তুলে নিয়ে নতুন স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এতে ইলিয়াস শাহ এবং তার লোকেরা ফিরোজ শাহের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করেছে ভেবে দুর্গের বাইরে চলে আসেন এবং দিলণ্ঢীর বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করেন।[৪০] ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ থেকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন এবং ইলিয়াস শাহের আগমণের খবর পেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ হয়তো পরাজিত হন অথবা তেমন সাফল্য অর্জন করতে না পেরে পুনরায় একডালায়

আশ্রয় নেন। কিন্তু দিলিণ্ডর ঐতিহাসিকগণ ইলিয়াস শাহের শোচনীয় পরাজয়ের কথা বলেছেন।[৪১] শোচনীয় পরাজয় ঘটলে ফিরোজ শাহ নিশ্চয়ই বাংলাদেশে স্থায়ী শাসন প্রবর্তন করতেন।

সিরাত-ই-ফিরুজ শাহীর মতে, ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গের অধিবাসীদের, বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের প্রেক্ষিতে একডালা দুর্গ পুনরায় অবরোধ ও আক্রমণে নিরস্ত হয়েছিলেন।[৪২] আসলে সেসব ঐতিহাসিকেরা ফিরোজের বাংলা অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই এসব অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন বলে মনে হয়। ফিরোজ শাহ যদি সত্যি সত্যিই মহিলাদের বে-ইজ্জতি ও মুসলমান হত্যা রোধ করতে আগ্রহী হতেন, তাহলে তিনি ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহের সময়ে দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করতেন না। আসলে ফিরোজ শাহ বুঝতে পারেন যে, ইলিয়াস শাহকে সম্পূর্ণ ধ্বংশ করে বাংলাদেশ জয় করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে হয়, ফিরোজ শাহ তাড়াতাড়ি দিলিণ্ড ফিরে যাবার ইচ্ছায় এবং ইলিয়াস শাহ তাড়াতাড়ি এই আপদ দূর করার ইচ্ছায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থে সন্ধিতে সম্মত হন।[৪৩] সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ কর্তৃক ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হয় এবং বাংলার সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে সমকক্ষ রাজা হিসেবে উভয়ের মধ্যে দূত ও উপহার বিনিময় হয়।[৪৪] এ যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ও তার পূর্বদিকে ইলিয়াস শাহের অধিকার কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। কিন্তু লখনৌতির পশ্চিমে যে সকল স্থান ইলিয়াস শাহ জয় করেছিলেন, সেগুলি ফিরোজ শাহের অধিকারভুক্ত হয়।[৪৫]

ত্রিপুরায় প্রভাব বিস্তার

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণ প্রতিহত করার পর ইলিয়াস শাহ বিনা বাধায় আরো কয়েক বছর রাজত্ব করেন। এই সময়েও তিনি রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবে এবার তিনি পূর্ব সীমান্তে মনোযোগ দেন। ইলিয়াস শাহ ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজমালা থেকে জানা যায়, ত্রিপুরা রাজ তার কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফাকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে মারা যান। কিন্তু তার মৃত্যুর পর অন্যান্য সতের জন ভাই রত্ন-ফাকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তাড়িয়ে দেয়। রত্ন-ফা বাংলার সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুলতান তাকে আশ্রয় দেন এবং সুলতানের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন ফিরে পান। প্রতিদানে রত্ন-ফা বাংলার সুলতানকে একটি মানিক ও কয়েকটি হাতি উপহার দেন এবং সুলতান রত্ন-ফাকে 'মাণিক্য' উপাধি প্রদান করেন।[৪৬]

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজ্যবিজয় এবং দিলিণ্ডর সুলতানের সাথে যুদ্ধের যত বিবরণ পাওয়া যায়, তার প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তত বিবরণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছিল দিলিণ্ডর সুলতানদের অধীনে একটি প্রদেশ হিসেবে। সে হিসেবে এ দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও রীতিনীতি দিলিণ্ডকে অনুসরণ করেই প্রচলিত হয়েছিল। সুলতান নিজে ছিলেন তার প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তাছাড়া রাজপ্রাসাদ সংগঠন, উজির ও অমাত্যবর্গ নিয়ে তার কেন্দ্রীয় প্রশাসন গঠিত হয়েছিল। সুলতান ইলিয়াস শাহ বাংলায় দিলিণ্ডর আধিপত্য উৎখাত করেছিলেন। এর আগে তুঘলক শাসনাধীনে বাংলাকে লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। তিনি এই তিনটি প্রদেশকে একত্র করে অখণ্ড, স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাঙ্গালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্ভবত তার রাজত্বকাল থেকেই রাজ্যের নাম লখনৌতি ব্যবহার হ্রাস পেতে থাকে এবং

দেশে বিদেশে বাঙ্গালা নামের ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৭] ইলিয়াস শাহ তার রাজধানী ফিরোজাবাদ-পাণ্ডুয়ায় স্থাপন করেছিলেন।[৪৮] অবশ্য তার পূর্ববর্তী শাসকদের আমলেই রাজধানী গৌড় লখনৌতি থেকে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। পুনর্গঠিত এই বাঙ্গালা রাজ্যকে কয়েকটি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। তার শাসনামলে শাসনকেন্দ্রসমূহের নামের পূর্বে মর্যাদা সূচক শব্দ ব্যবহৃত হত, যেমন- হযরত ফিরোজাবাদ, হযরত জালাল সোনারগাঁও, আল বালাদ সাতগাঁও, আল বালাদ শহর-ই-নও ইত্যাদি।[৪৯] তার শাসনামলের টাকশালগুলি ফিরোজাবাদ, সোনারগাঁও সাতগাঁও এবং শহর-ই-নৌ এ অবস্থিত ছিল।[৫০] এ থেকে ধারণা করা যায় যে তার প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রগুলি এসব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য রাজ্যের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও সহায়তা যে অত্যন্ত প্রয়োজন সুলতান ইলিয়াস শাহ তার স্বভাবজাত দূরদৃষ্টির দ্বারা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ব্যাপক উদার নীতির উপর ভিত্তি করে তার প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। দিলিণ্ড থেকে পালিয়ে আসার সময় তার সাথে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। প্রধানত স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় থেকেই তার দুর্জয় বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাছাড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও তাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন। তারিখ-ই-মোবারক শাহীর মতে, তার সাথে দিলিণ্ডর সুলতানের যুদ্ধের সময়ে সহদেব নামক একজন হিন্দু সেনাপতিত্ব করেছিলেন।[৫১] সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে যেমন তিনি শাসন ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল করে তুলেছিলেন, তেমনি সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ও তার ক্ষমতার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। হিন্দু জমিদার-সামন্তদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় শাসন করতে দিতেন। অমুসলমান প্রজাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ না করে প্রচলিত রাজস্ব আদায় প্রথাই তিনি বহাল রেখেছিলেন।

দিলিণ্ডর ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ইলিয়াস শাহকে বাঙ্গালার অধিপতি বলে উলেণ্ডখ করায় ধরে নেয়া যায় যে বাঙ্গালা নামে একটি অখণ্ড রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সুলতান। তার পূর্বে আর কোন সুলতান শাহ-ই-বাঙ্গালা অভিহিত হন নাই। উপমহাদেশের মানচিত্রে বাঙ্গালা নামে একটি অখণ্ড রাজ্য নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হল। এই বাঙ্গালা রাজ্যেই কালক্রমে বাংলাভাষা, বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজের বিকাশ ঘটতে লাগল। যেহেতু ইলিয়াস শাহ বিশাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, সেহেতু তার সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তাই তিনি রাজধানী ফিরোজাবাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন বরনির মতে, দিলিণ্ডর সুলতান ফিরোজ শাহ কিছুদিনের জন্য পাণ্ডুয়া দখল করলেও ইলিয়াস শাহের প্রাসাদ এবং প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান নষ্ট করেন নাই।[৫২]

উপসংহার

ইলিয়াস শাহের বাংলার সিংহাসনারোহণ বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রিত করে এর উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং দিলিণ্ডর আধিপত্য প্রতিহত করে স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠা পর্ব সমাপ্ত করেন। বাংলার এই স্বাধীনতা দুইশত বছরের ও বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল। সুলতান ইলিয়াস শাহ তার জীবনের প্রায় সমগ্র কার্যকাল বাংলাতেই অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর রাজত্ব করেন। তার এই দীর্ঘ রাজত্বকালে রাজ্যের কোথাও বিশৃঙ্খলা বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। এমনকি তিনি যখন রাজ্যজয়ে বের হতেন তখনও রাজধানীতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করত। এ

থেকে তার জনপ্রিয়তা ও সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকাল থেকেই বাংলার মুসলিম রাজ্য নিজস্বতা লাভ করে এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেশীয় রাজ্যে রূপ লাভ করে। তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ যেমন বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত ছিল, তেমনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগেই বাংলা ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছিল। ইলিয়াস শাহ কবে বা কিভাবে ইন্তিকাল করেছিলেন সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এবং ইলিয়াস শাহের সর্বশেষ ১৩৫৭ সালের মুদ্রা আবিস্কৃত হওয়ায় ধারণা করা হয় তিনি উলিণ্ঢখিত বছর ইন্তিকাল করেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৮২।

২ তাঁরা দুজনই আরবের চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রামাণিক ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত। আল সাখাভি এর *আল জউ উল লামি* গ্রন্থে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ কর্তৃক আরবভূমিতে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং আরো কয়েকটি প্রসঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। ইবন-ই-হজর এর *ইন বাউল গুমর* গ্রন্থে ইলিয়াস শাহী বংশ এবং রাজা গণেশের বংশের কয়েকটি উলেণ্ঢখযোগ্য ঘটনার উলেণ্ঢখ আছে।

৩ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস: ১২০৪-১৫৭৬* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৫), পৃ. ২০৯।

৪ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।

৫ গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* সম্পা., শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ৮১।

৬ এ.কে.এম.শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৮৪।

৭ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।

৮ *তদেব*।

৯ Ahmad Hasan Dani, "Significance of the Establishment of the Independent Sultanate in Bengal," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum. Vol. 42, No. 2, December 1997, p. 131.

১০ মমতাজুর রহমান তরফদার, "প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতি", অন্তর্গত, মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, সম্পা. *বাঙালির আত্মপরিচয়* (ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০০১), পৃ. ৫৫।

১১ হুমায়ুন আজাদ, *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ১২।

১২ আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী", অন্তর্গত, সফর আলী আকন্দ (সম্পা.), *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯১), পৃ. ৭৬।

১৩ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ৪০৫।

১৪ Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009), p. 93-94.

১৫ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ২য় খ (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৯৪।

১৬ Md. Akhtaruzzaman, *op. cit.*, p. 93.

১৭ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ১৮৪।

১৮ *তদেব*।

১৯ Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2003), p. 133.

২০ Jadunath Sarkar, ed., *The History of Bengal*, Vol. 2 (Dhaka: The University of Dhaka, 2006), pp. 103-104.

২১ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।

২২ Jadunath Sarkar, ed., *op. cit.,* Vol. 2, pp. 103-104.

২৩ *তদেব*, পৃ. ২৮৩।

২৪ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

২৫ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ১৮৬।

২৬ *তদেব*।

২৭ Muhammad Mohar Ali, *op. cit.*, p. 135.

২৮ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ১৯৭।

২৯ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩০ জিয়াউদ্দিন বরনি, *তারিখ-ই-ফির জশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪৮২-৮৩।

৩১ রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃ. ৬১।

৩২ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ১৮৬; সৌমিত্র শ্রীমানী, *সুলতানি রাজত্বকালে ভারত* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪) পৃ. ২৮৬।

৩৩ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।

৩৪ *তদেব*, পৃ. ২২৫।

৩৫ সুখময় মুখোপাধ্যায় এখানে বন্ধনীর মধ্যে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ লিখেছেন। কিন্তু ড. করিমের মতে শামসুদ্দীন ইলতুতমিশকে বুঝানো হয়েছে।

৩৬ স্থানীয় ভাষায় ডালার অর্থ দ্বার বা দরজা। তিন দিক দিয়ে নদী, পরিখা ও ঘন জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত দুর্গের শুধু একদিক দিয়ে দ্বার ছিল বলে একে একডালা দুর্গ বলা হত। এর অবস্থান নিয়ে পি তদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধনজর পরগনায় একডালা নামে যে গ্রামটি, সেখানেই অবস্থিত ছিল ঐতিহাসিক দুর্গটি।

৩৭ তারিখ-ই-ফির জশাহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৪।

৩৮ *তদেব*, পৃ. ৪৮৫।

৩৯ *তদেব*।

৪০ মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা, *তারিখ-ই-ফিরিশতা*, বঙ্গানুবাদ মুহাম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৩৫৮।

৪১ তারিখ-ই-ফির জশাহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৭; তারিখ-ই-ফিরিশতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮।

৪২ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ*, পরিমার্জিত সংস্করণ (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবিণ্ঢশার্স প্রা. লি., ২০০৫), পৃ. ২৫।

৪৩ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, পৃ. ১৯৫।

৪৪ Yahiya Bin Ahmad Bin Abdullah Sirhindi, *The Tarikh-i-Mubarakshahi*, Englilsh Translation by K. K. Basu (Baroda: Oriental Institute, 1932), p. 131; রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃ. ৮৪।

৪৫ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

৪৬ মুহম্মদ আবদুর রহিম প্রমুখ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৪৭ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৪৮ Charles Stewart, *The History of Bengal,* (Delhi: Oriental Publishers, 1971), p. 86.

৪৯ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৫০ শহর-ই-নৌ টাকশালের স্থানটি এখনও অজ্ঞাত। তবে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, এটি পর্যটক নিকলো কান্তির ভ্রমণ বিবরণে উলিণ্ঢখিত গঙ্গাতীরে অবস্থিত শেরনেব শহরের সঙ্গে অভিন্ন।

৫১ *The Tarikh-i-Mubarakshahi*, *op.cit.*, p. 129.

[৫২] তারিখ-ই-ফির"জশাহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫।